

Vol. 59 | No. 1-2 | 2024

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আবুল মনসুর আহমদের আয়না: সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি

Volume	59
Issue	1-2
Year	2024
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mohammad Sakibul Hasan
Published online	December 31, 2024
DOI	10.62328/sp.v59i1-2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v59i1-2.5
Pages	97-118
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৯ সংখ্যা: ১-২
ফাল্গুন ১৪৩০॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৪
Issue DOI: 10.62328/sp.v59i1-2

DOI: 10.62328/sp.v59i1-2.5
প্রবন্ধ জমাদান: ১৫ জানুয়ারি ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ৫ মে ২০২৪
পৃষ্ঠা: ৯৭-১১৮

আবুল মনসুর আহমদের *আয়না*: সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি

মোহাম্মদ সাকিবুল হাসান
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: mshasan@bu.ac.bd

সারসংক্ষেপ

সমাজসচেতন লেখক হিসেবে আবুল মনসুর আহমদ (১৮১৮-১৯৭৯) তাঁর সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও ধর্মীয় অবক্ষয়ের চিত্র অবলোকন করেছেন তীক্ষ্ণ ও বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে। আইনজীবী, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ হিসেবে সমকালের নানাবিধ অন্যায়-অসংগতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর সমাজসচেতন বিশ্লেষণধর্মী সাহিত্যচেতনা গঠনে সাহায্য করেছে। তাঁর সাহিত্যচিন্তার মূলে ক্রিয়াশীল ছিল আক্রমণের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক আদর্শহীনতা, ধর্মব্যবসা, রক্ষণশীলতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সামাজিক অসংগতির সংশোধন। বাঙালি মুসলমানদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির লক্ষ্যে তিনি সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাই সামাজিক অগ্রগতির অন্তরায় হিসেবে তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদতার কার্যকারণ সন্ধান করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে আবুল মনসুর আহমদের প্রগতিশীল সমাজচিন্তা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতি-ভাবনার অনুসন্ধান করা হয়েছে।

মূলশব্দ

সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়, পিরপ্রথা, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, খেলাফত আন্দোলন, হানাফি-মোহাম্মদী দ্বন্দ্ব, ইংরেজদের বিভেদনীতি, ধর্মীয় গোঁড়ামি।

আবুল মনসুর আহমদ (১৮১৮-১৯৭৯) যে সকল পেশায় নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন, তার সবগুলোই ছিল সমাজ ও জনমনস্তত্ত্ব উপলব্ধির ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক। তিনি যেমন একজন দক্ষ আইনজ্ঞ ছিলেন, তেমনি ছিলেন একজন প্রথিতযশা সাংবাদিক, তদুপরি একজন সফল রাজনীতিবিদ। এই ত্রিমাত্রিক পেশাগত অভিজ্ঞতা জীবন, জগৎ, সমাজ, রাজনীতি ও ধর্ম-ভাবনার ক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহমদকে দিয়েছিল স্বতন্ত্র মাত্রা। এই ত্রিবিধ অভিজ্ঞতার সফল ও সচেতন প্রয়োগ ঘটেছে তাঁর সাহিত্য রচনায়। ওকালতি, সাংবাদিকতা ও রাজনীতি করতে গিয়ে তিনি সমাজের মর্মমূলে প্রবেশ করে সাধারণ মানুষের ওপর শাসকদের বিভিন্নমুখী অত্যাচার, শোষণ, দুর্নীতি, অনাচার, অধর্ম, ভণ্ডামি, ব্যভিচার, কূপমণ্ডূকতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করেছেন এবং এই সকল অসংগতি থেকে উত্তরণের হাতিয়ার হিসেবে সাহিত্যকে মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তাছাড়া আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনগ্রসর মুসলমান সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় কুসংস্কার, পিরপ্রথা, মোল্লাতন্ত্র, ইংরেজ শাসকের আধিপত্যবিস্তারী মনোভাব, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয় আবুল মনসুর আহমদ তাঁর সাহিত্যে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের ওপর জেঁকে বসা অনাধুনিক চিন্তাচেতনা, অশিক্ষা, কুসংস্কার আবুল মনসুর আহমদকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল। শুধু তাই নয়, সনাতন সমাজে প্রচল ধর্মীয় গোঁড়ামির মুখোশও উন্মোচন করেছেন তিনি। যে সময়, সমাজ ও রাজনৈতিক পরিবেশে আবুল মনসুর আহমদের বেড়ে ওঠা, সেই সময়, সমাজ ও রাজনীতি ছিল বিচিত্র সমস্যায় জর্জরিত। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিমণ্ডল ছিল অসৎ, অসাধু ও মুখোশধারী ভণ্ডদের দখলে। একটি সুস্থ রাজনৈতিক ও সহাবস্থানশীল ধর্মীয় পরিবেশের বিপরীতে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন—

> নির্বাচনের নামে প্রহসন, ভোট কেনাবেচার ব্যবসা, মন্ত্রিত্বের কল্যাণে পকেট ভারী করার কৌশল, শাসনের নামে শোষণ, ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার জন্যে নিজের দলের প্রতি অপরিমেয় ভক্তি ও প্রীতি, পারমিটবাজদের তোষণনীতি, ফটকাবাজি ব্যবসায় আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার ব্যাপার, দলীয় স্বার্থের খাতিরে দলন ও দমননীতি। সামাজিক ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ দলাদলি, দুর্বলের ওপর সবলের নিপীড়ন, ব্যভিচার, অনাচার ও মিথ্যাচার। ধর্মীয় ক্ষেত্রে দেখেছেন ভণ্ডামি, মূর্খতা, ধর্মের নামে গোঁড়ামি, লোভ-লালসা, আসঙ্গ-লিপ্সা, কুসংস্কার ও মোল্লা মৌলবিদের পারস্পরিক কুৎসা রচনা, হীনমন্যতা, ইসলামী শিক্ষার নামে প্রতিবাদী ধ্যান-ধারণায় বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িক কলহে ইন্ধন সৃষ্টি। (আজহার ২০১৪: ৬১)

আবুল মনসুর আহমদের মানসমূলে ক্রিয়াশীল ছিল প্রগতিশীল সমাজ ও রাজনীতি-ভাবনা। সমাজ-মানস থেকে ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, ধর্মীয় উন্মাদনা, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, পশ্চাৎপদতা ও অন্ধভক্তির অনভিপ্রেত অপচ্ছায়া দূর করে মুক্ত আলো ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি। ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র আবুল মনসুর আহমদকে যেমন ব্যথিত করেছে, তেমনি লেখনীর মাধ্যমে সমাজের এই ক্ষত নিরাময়ের ভার তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, শোষিত মানুষের প্রতি তাঁর ছিল এক গভীর মমত্ববোধ। এই মমত্ববোধে আলোড়িত, উদ্দীপিত হয়েই তিনি মানুষের চিত্তলোকে সঞ্চার করতে চেয়েছেন প্রগতিশীল ভাবনার বীজমন্ত্র। লেখনীর মাধ্যমে তিনি সমাজসংস্কার করতে চেয়েছিলেন। সমকালীন বাঙালি সমাজের নানা অসংগতির চিত্র অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে আবুল মনসুর

আহমদ তাঁর গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। কবিতা রচনার মাধ্যমে সাহিত্যে হাতেখড়ি হলেও, একজন কথাসাহিত্যিক হিসেবেই বাংলা সাহিত্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন তিনি। কবিতা, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, আত্মজীবনীসহ সাহিত্যের নানা শাখায় তিনি বিচরণ করেছেন; কিন্তু গল্প-উপন্যাসেই তিনি স্পর্শ করেছেন সফলতার শীর্ষবিন্দু।

আবুল মনসুর আহমদ ব্যঙ্গের কশাঘাতে সমাজের নানা অসংগতির চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর এই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের উপরিতলে হাস্যরস থাকলেও অন্তস্তলে ক্রিয়াশীল ছিল সমাজ শোধনের এক অতলান্ত্রিক টান। সমকালীন বাঙালি সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক প্রথাবদ্ধতা, মানসিক জড়তা ও কুসংস্কার, রাজনৈতিক কপটতা তাঁর চিন্তাচেতনাকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছে। এমন প্রতিকূল সমাজবাস্তবতার মধ্যেও তিনি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ একজন লেখক হিসেবে আপন মনীষা ও মননে, মানবিক প্রেমে, যুক্তিতে ও বুদ্ধিতে দৃঢ়তার সাথে স্বীয় ব্যক্তিত্বকে প্রতিফলিত করেছেন *আয়না* (১৯৩৫) গ্রন্থে। এ সম্পর্কে আনিসুজ্জামানের উক্তি প্রণিধানযোগ্য:

> আবুল মনসুর আহমদের সব গল্পেই আমাদের সংকীর্ণতা-শঠতা-অজ্ঞতা নিয়ে ব্যঙ্গের সঙ্গে দুঃখবোধ জড়িত। ... আবুল মনসুর আহমদ সমাজের সংস্কার চেয়েছেন, সংস্কারের ক্ষেত্রগুলো দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর গল্পে। এই উদ্দেশ্যমূলকতা যে শিল্পকে ছাড়িয়ে যায়নি, এটা তাঁর একটা বড় গুণ। অধিকাংশ গল্পে তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজের ভেতরের কথা বলেছেন। (আনিসুজ্জামান ২০১৫: ১৬৯)

আবুল মনসুর আহমদ ধর্মান্ধ মুসলমান সমাজের অন্তঃসারশূন্যতাকে ব্যঙ্গের কশাঘাতে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাঁর ব্যঙ্গের উপরি-কাঠামো হাস্যরসাত্মক হলেও, এর ভেতরে লুকিয়ে আছে মানুষের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ। বন্ধু আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে (১৮৯৭-১৯৭৮) লেখা *আয়না* গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে এই গ্রন্থরচনায় আবুল মনসুর আহমদের অভিপ্রায় সম্পর্কে জানা যায়। তিনি লিখেছেন: 'বন্ধুরা বলছেন, এই বইয়ে আমি সবাইকে খুব হাসিয়েছি। কিন্তু এই হাসির পেছনে যে কতটা কান্না লুকিয়ে আছে, তা তুমি যেমন জান, তেমন আর কেউ জানে না। (আবুল মনসুর ২০১৪: ৩৭)

আবুল মনসুর আহমদ তাঁর *আয়না* গ্রন্থে মুখোশধারী মানুষের মুখোশের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা শঠতা ও ভণ্ডামির স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। ধর্মের নামে যারা সমাজে অধর্ম করে বেড়ায় তাদেরকে তিনি তির্যক ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তাঁর এই আক্রমণ, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও পরিহাসপ্রিয়তা নিছক হাস্যরস সৃষ্টির জন্যে নয়; এর পেছনেও কাজ করেছে আবুল মনসুর আহমদের তীব্র সমাজচেতনা ও সামাজিক কল্যাণবোধ। সমকালীন সমাজজীবনের যেসব অসংগতি তাঁর কাছে একটি প্রগতিশীল ও প্রাগ্রসর সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ মনে হয়েছে, সেখানেই তিনি তির্যক বাণীভঙ্গিতে আঘাত করেছেন, আর প্রকাশ করেছেন অন্তর্গত বেদনার কথা। এ প্রসঙ্গে *আয়নার* ভূমিকা হিসেবে সংযোজিত কাজী নজরুল ইসলামের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য:

> এমনি আয়নায় শুধু মানুষের বাইরের প্রতিচ্ছবিই দেখা যায়, কিন্তু আমার বন্ধু শিল্পী আবুল মনসুর যে আয়না তৈরি করেছেন, তাতে মানুষের অন্তরের রূপ ধরা পড়েছে। যে-সমস্ত মানুষ হরেক রকমের মুখোস পরে আমাদের সমাজে অবাধে বিচরণ করছে, আবুল মনসুরের আয়নার ভেতরে তাদের স্বরূপ-মূর্তি বন্য ভীষণতা নিয়ে ফুটে উঠেছে। মানুষের মুখোস পরা এই বনমানুষগুলোর সবাইকে মন্দিরে, মসজিদে, বক্তৃতার মঞ্চে, পলিটিক্সের আখড়ায়, সাহিত্য-সমাজে যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। ... আবুল মনসুরের ব্যঙ্গের একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, সে ব্যঙ্গ যখন হাসায়, তখন হয় সে ব্যাঙ, কিন্তু কামড়ায় যখন, তখন হয় সে সাপ; আর সে কামড় গিয়ে যার গায়ে বাজে, তার মুখের ভাব হয় সাপের মুখের ব্যাঙের মতোই করুণ! কিন্তু সে হাসির পেছনে যে অশ্রু আছে, সে কামড়ের পেছনে যে দরদ আছে, তা যাঁরা ধরতে পারবেন, আবুল মনসুরের ব্যঙ্গের সত্যিকার রসোপলব্ধি করতে পারবেন তাঁরাই। (নজরুল ২০১৪: ৩৫)

সমাজ ও মানুষের অন্তর্জগৎকে আরো গভীরভাবে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে তাঁকে সহায়তা করেছিল ওকালতি, রাজনীতি ও সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর বিশেষ সহানুভূতি ছিল। অশিক্ষা, কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসে ডুবে থাকা সমাজচৈতন্যে তিনি প্রাণের সঞ্চার করতে চেয়েছেন সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে। আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্যচর্চা শুধু সাহিত্য সৃষ্টির জন্য ছিল না, সমাজশোধন ও সমাজসংস্কারই ছিল তাঁর সাহিত্যচর্চার মূল চালিকাশক্তি। তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবন ও পেশাগত অভিজ্ঞতার পুরোটাই ব্যয় করেছিলেন মানুষের মুক্তির জন্য। এমনকি, রাজনীতিও তাঁর কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার ছিল না। নিত্য ঘটে যাওয়া তাঁর চারপাশের যাপিত জীবনের নানামাত্রিক অন্যায়, অবিচার, অসংগতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন তিনি করেছেন একজন সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে। সামাজিক পরিমণ্ডল, সাহিত্যাঙ্গন, রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে শুরু করে সাংবাদিকতা পর্যন্ত তাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্পর্শে পরিপুষ্টি অর্জন করেছে। সমাজের সত্যচেহারা উন্মোচনের প্রয়োজনে তিনি যে প্রকাশ-প্রক্রিয়া বিছে নিয়েছিলেন তা সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে ছিল তাৎপর্যবহ। একজন সমালোকের বক্তব্য স্মরণযোগ্য:

> আবুল মনসুর আহমদের লেখায় দেশ ও দেশের মানুষের সমস্যার প্রত্যক্ষ পর্যালোচনা আছে। ব্যঙ্গবিদ্রুপের আঘাতে সমাজ ও দেশের চৈতন্য জাগরণ তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তাই তাঁর সাহিত্য আমাদের দেশ ও দেশের মানুষের কাছে তাৎপর্যবহ। (মনিরুজ্জামান ২০১৫: ২০)

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন:

> তাঁর সাহস ছিল। অসংগতির স্বরকে ছাপিয়ে ওঠার স্বর ছিল আয়ত্তে। তিনি হাসির মধ্য দিয়ে ধমকে দিয়েছেন ভয়ংকরকে। (সিরাজুল ২০১৫: ১৪)

আবুল মনসুর আহমদের রাজনীতি করার মূলে যেমন ক্রিয়াশীল ছিল মানবকল্যাণ, তেমনি তাঁর সাহিত্যচর্চার মূলেও ক্রিয়াশীল ছিল মানুষকে সমাজসচেতন করার মাধ্যমে তাদের মানসিক অচলায়তন ভাঙার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। মানুষের অন্ধবিশ্বাসের মর্মমূলে আঘাত করে তাদেরকে জাগিয়ে তোলাই ছিল তাঁর সাহিত্য রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। সমকালীন সমাজ ও

রাজনীতির প্রকৃত রূপ অনুধাবনে তিনি যেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি নিজের বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ছিলেন নির্ভীক ও স্পষ্টভাষী।

আয়না গ্রন্থ সমকাল-পরিসরে চর্চিত ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির দর্পণস্বরূপ। আবুল মনসুর আহমদ তাঁর *আয়না* গ্রন্থে ধর্মব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদদের প্রতারণা ও ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন করতে চেয়েছেন। ধর্মীয় কুসংস্কার এবং তজ্জাত অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর সমাজ ও রাজনৈতিক চিন্তার বহুমাত্রিক পরিচয় বিধৃত হয়েছে *আয়না* গ্রন্থে। এই গল্প-সংকলনের প্রথম গল্প 'হুযুর কেবলা'য় বাংলাদেশের গ্রামজীবনে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা পিরপ্রথার ভয়ংকর চিত্র উপস্থাপন করেছেন তিনি। 'হুযুর কেবলা' গল্পে বর্ণিত হয়েছে এক ভণ্ড পিরের রিরংসাবৃত্তি, তার শঠতা, পীড়ন ও প্রতারণা, তার অন্ধ অনুসারীদের ভণ্ডামি ও মিথ্যাচার, সর্বোপরি এক প্রতিবাদী যুবকের বিদ্রোহ-প্রসঙ্গ। সমকালে পিরপ্রথার নামে সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে ধর্মব্যবসায়ীরা কীভাবে প্রতারণার জাল বিস্তার করেছিল তারই শৈল্পিক উপস্থাপনা 'হুযুর কেবলা' গল্প। ধর্মের মুখোশধারী এই প্রতারকদের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনে তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। তিনি মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন অসংগতি, কপটতা, ধর্মের নামে ভণ্ডামি, অজ্ঞতার চিত্র ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও হাস্য-পরিহাসের মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন, যেন তারা এ থেকে সংশোধিত হতে পারে এবং শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে পিরপ্রথা ও ধর্মান্ধতা মুসলমান সমাজে এক সামাজিক ব্যাধির আকার ধারণ করে। মুসলমান সমাজে পিরপ্রথার এই সর্ববিস্তারী প্রভাব সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ তাঁর *আত্মকথায়* লিখেছেন:

> এক শ্রেণির মুসলমানদের পির ভক্তি এই সময় এমন চরম সীমায় উঠিয়াছিল যে, উহা স্পষ্টতঃই ইসলামের মৌলিক শিক্ষার বিরোধী। এই শ্রেণির মুসলমানের কথাবার্তায়, কাজে কর্মে আল্লার পানা না চাহিয়া পির সাহেবদের পানা চাহিতেন। যেমন তাঁরা 'ইন্‌শাহআল্লাহ এই কাজ করিব', 'খোদার ফজলে ভালোই আছি', 'আল্লার মর্জীতে এটা হইয়াছে', ইত্যাদি না বলিয়া 'হুজুর পাকের ইচ্ছা হইলে একাজ করিব', 'হুজুর কেবলার মেহেরবানিতে ভালোই আছি', 'খাজাবাবার দোওয়াতে এটা হইয়াছে', ইত্যাদি বলিতেন। মোটকথা, এঁরা যাঁর-তাঁর পির সাহেবদের দিয়া আল্লার জায়গা দখল করাইয়াছিলেন। (আবুল মনসুর ২০১৯: ১৫৩)

আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজের ওপর জেঁকে বসা অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। কারণ তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, ধর্মীয় গোঁড়ামির বেড়াজাল থেকে মুসলমান সমাজকে মুক্ত করতে না পারলে তাদের পক্ষে উন্নতি করা কখনো সম্ভব নয়। কারণ—

> ধর্মের ক্ষেত্রে লেখক দেখেছিলেন ধর্মের নামে বিবিধ গোঁড়ামি—হিন্দু-মুসলিম বিবাদ, একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মীয় খুঁটিনাটি নিয়ে দ্বিমত ও কলহ, রক্ষণশীলতা, ধর্ম-ব্যবসা, ভণ্ডপীরদের কীর্তিকলাপ। (রাজীব ১৯৮৫: ৫)

'হুযুর কেবলা' গল্পে দর্শন শাস্ত্রে অধ্যয়নরত এমদাদ কলেজ ছেড়ে দিয়ে বিলাতি ধুতি ও সিল্কের জামা পুড়িয়ে, পাম্পশুগুলো বাবুর্চিখানার বটি দিয়ে কুপিয়ে নষ্ট করে, চশমা ও হাতঘড়ি

ভেঙে ফেলে, ক্ষুর-স্ট্রপ-শেভিংস্টিক-ব্রাশ নদীতে ফেলে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে। যে এমদাদ কলেজ জীবনে মিল, হিউম, স্পেন্সার, কোমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে খোদার অস্তিত্বের প্রশ্নে সন্দিহান ছিল, খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের পর সেই এমদাদ আমূল বদলে যায়। দিনরাত নামাজ, জিকির, তসবিহ জপেও যখন এবাদতে আশানুরূপ নিষ্ঠা আনতে পারছিল না, তখন সে পির সাহেবের স্থানীয় খলিফা সাদুল্লার মাধ্যমে হুজুর কেবলার কাছে মুরিদ হয়। মুরিদ হবার পর বাড়ি ছেড়ে আসার বেদনা আর অনাহারে অনিদ্রায় এমদাদের শরীর অত্যন্ত দুর্বল ও মন অস্থির হয়ে উঠলেও নিজের অক্ষমতা বিবেচনায় সে পিরের কাছেই থেকে যায়। অতঃপর দূরবর্তী এক স্থানে মুরিদদের আমন্ত্রণে পিরের সঙ্গী হয়ে তাঁর চরিত্রের অসারতা, নারীলিপ্সা ও ধর্মীয় ভণ্ডামির চূড়ান্ত রূপ প্রত্যক্ষ করে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।

হুযুর কেবলা এশার নামাজের পর বাড়ির অন্দরমহলে লম্বা সময় নিয়ে মেয়েদের নসিহত করতেন। কারণ তিনি মনে করতেন, মেয়েদের বুদ্ধিসুদ্ধি পুরুষের চেয়ে কম বিধায় ধর্মকথা ভালোভাবে বুঝতে তাদের বেশি সময়ের প্রয়োজন। অন্দরমহলে ধর্মকথা শোনানোর এক পর্যায়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে নারীদের কাছ থেকে শারীরিক পরিচর্যা গ্রহণ করতেন। একপর্যায়ে তিনি তাঁর অনৈতিক যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য মুরিদের পুত্রবধূ রজবের সুন্দরী স্ত্রী কলিমনের দিকে লোভী হাত বাড়িয়ে দেন। তাকে ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় মোরাকেবার আয়োজন করলে এমদাদ বুঝে ফেলে—এটি পীর সাহেবের ভণ্ডামি ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। সে এতদ্বিষয়ে গ্রামবাসীকে সচেতন করতে গিয়ে বলে: 'তোমরা নিতান্ত মূর্খ। এই ভণ্ডের চালাকি বুঝিতে পারিতেছ না? নিজে শখ মিটাইবার জন্য হযরত পয়গম্বর সাহেবকে লইয়া তামাসা করিয়া তাঁর অপমান করিতেছে। তোমরা এই শয়তানকে পুলিশে দাও' (আবুল মনসুর ২০১৪: ৫২)। ধূর্ত ও নারীলিপ্সু পিরের কর্মকাণ্ডে এমদাদের আত্ম-উন্মোচন ঘটলেও মাতব্বর ও অন্য মুরিদরা তাকে মস্তিস্ক বিকৃতির অপবাদ দিয়ে গ্রাম থেকে বের করে দেয়। অন্ধকারই হয়ে ওঠে তাদের নিয়তি।

আবুল মনসুর আহমদের সমকালে হুজুর কেবলার মতো এমন অসংখ্য ভণ্ড পির সাধারণ মানুষের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অশিক্ষার সুযোগে তাদেরকে প্রতারিত করেছে। তাই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল এই সব ভণ্ড পিরের মুখোশ উন্মোচন করে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা। এমদাদ চরিত্রের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাতও লক্ষ করা যায়। লেখক নিজেও দর্শনের ছাত্র ছিলেন এবং খেলাফত আন্দোলনের একজন সক্রিয় নেতা ছিলেন। সাধারণ মানুষকে ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতারণার ফাঁদ থেকে বাঁচানোর তাগিদ থেকেই হয়তো লেখক তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতাকে সুকৌশলে কাজে লাগিয়েছেন 'হুযুর কেবলা' গল্পে। সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির দ্বারা আবুল মনসুর আহমদ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিলেন। সমাজের কল্যাণসাধনই ছিল তাঁর সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক জীবনের ব্রত। এমদাদের মতো তাঁকেও অনেক চড়াই-উতরাইয়ের মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজভাবনায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। আবুল মনসুর আহমদের শৈশব জীবন সম্পর্কে একজন সমালোচক লিখেছেন:

> মূলত আবুল মনসুর আহমদের শৈশবের পারিবারিক পরিবেশ মোটেই গোঁড়ামি মুক্ত ছিল না। মোহাম্মদী পরিবারের ধর্মীয় সকল কড়াকড়ির মধ্যে তাঁর জন্ম ও বৃদ্ধি এবং সেখানে

> সবকিছু বিচার্য ছিল ধর্মের ভিত্তিতে। এমনকি শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটে নি। সে সব কড়াকড়ি শুধু যে বাপ-দাদা কর্তৃক আরোপিত হতো তা নয়, বরং সামাজিক দিক থেকেও কড়াকড়ি আরোপিত হতো। (নুরুল ২০১১: ৩৬)

লেখক তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই পিরপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করার জন্য এমদাদের মতো এমন একটি প্রতিবাদী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন এবং এই ঘৃণ্য প্রথা থেকে মানুষকে মুক্ত হবার পথও নির্দেশ করেছেন। 'হুযুর কেবলা' গল্প সম্পর্কে সমালোচক যথার্থই বলেছেন: 'মূলত প্রত্যকটি ঘটনা উপস্থাপনে গল্পকারের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় ভণ্ডামির ধরন ও তার মুখোশ উন্মোচন এবং অপ্রয়োজনীয় রীতিনীতির অসারতা প্রমাণ করা।' (সরিফা ২০২২: ৭৪)

'গো-দেওতা-কা দেশ' গল্পে আবুল মনসুর আহমদ সমকালীন সমাজবাস্তবতার চিত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে স্বপ্নের আবহে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিভেদনীতি 'Divide and Rule' এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয়কে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার প্রকল্প হিসেবে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কে ফাটল ধরানো ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর হীন চক্রান্তের কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো কলঙ্কিত ঘটনা ঘটে; যেগুলোর মধ্যে ১৯২৬ ও ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক। 'গো-দেওতা-কা দেশ' গল্পে আবুল মনসুর আহমদ মানুষের ভেতরের পশুত্বের চিত্র উন্মোচন করেছেন স্বপ্নের আবহে। উত্তম পুরুষে লেখা গল্পটির কাহিনি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, যেখানে দেখা যায় গল্পকথক স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে শাস্তি দেবার জন্য সারাদিন বাইরে থাকার সংকল্প করে। কিন্তু স্ত্রীর নিস্পৃহতা প্রত্যক্ষ করে গল্পকথক তার বন্ধু রশিদের বাসায় গিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, তারা নৌকাভ্রমণে বের হবে। যদিও নৌকাভ্রমণের কথা শুনে কথকের পিলে চমকে ওঠে। কারণ তার ছেলেবেলায় এক গণক ঠাকুর বলেছিল যে, পানিতে ডুবে তার মৃত্যু হবে। এরপর থেকে সে নদী তো দূরে থাক, ডুবে মরবার ভয়ে পুকুরে পর্যন্ত নামেনি। একবার বর্ষাকালে নিতান্ত দায়ে পড়ে গ্রামের বাড়িতে যাবার সময় যা ঘটেছে তা সে বিবৃত করেছে এভাবে—

> প্রায় পনের হাত প্রশস্ত এক নদীর খেয়া পার হইতে গিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া খোদার নাম লইয়া নৌকায় উঠিলাম। পাঁচ ছয় জন আরোহীর ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়া আল্লার নাম যপ করিতে লাগিলাম। কিন্তু নৌকা যেই মাঝ নদীতে গিয়া পড়িল, অমনি হাঁটু দু'টি ঠকঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি মূর্ছিত হইয়া পড়িলাম। (আবুল মনসুর ২০১৪: ৫৩)

নৌকায় ওঠার এমন দুঃসহ স্মৃতি তাকে ভড়কে দিলেও কেবল স্ত্রীকে শাস্তি দেবার জন্য সে মনস্থির করে নৌকাভ্রমণে যাবার। অবশেষে নৌকাভ্রমণের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যখন আসে, তখন সবাই মহা আনন্দে নৌকায় উঠতে শুরু করে, কিন্তু কথকের মনে কোনো আনন্দ ছিল না। কারণ বন্ধুদের মধ্যে যারা নৌকাভ্রমণে যাচ্ছে তারা সবাই সাঁতার জানলেও, কেবল সে-ই সাঁতার জানে না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফাঁসির আসামির মঞ্চে আরোহণের মতো গল্পকথকও নৌকায় আরোহণ করে, এবং মগ্নচৈতন্যে সমর্পিত হয়। একপর্যায়ে বন্ধুদের কোলাহলে

ধ্যানভঙ্গ হলে সে দেখতে পায়, ভাসতে ভাসতে এক বিশাল দুগ্ধ-সাগর অতিক্রম করে এক পাথরের দেশে উপনীত হয়েছে সে। সে তার আশেপাশে মানুষ নয়, কেবল গরু আর গরুই দেখতে পায়। এই গো-রাজ্যে উপস্থিত হয়ে তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ধর্মীয় বিশ্বাসে সে মুসলমান জেনে গরুকুল তাকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে, এবং 'অনার্য', 'ম্লেচ্ছ' সম্বোধন করে আঘাত করতে উদ্যত হলে গো-সরদারের আনুকূল্যে সে প্রাণে রক্ষা পায়। অবশেষে গো-সরদারের কাছ থেকে সে এই দুগ্ধ-নহর ও তাদের পাহাড়ে বসবাসের মূল রহস্য সম্পর্কে জানতে পারে। গো-সরদার তথা বলদের জবানিতে গল্পকথক বুঝতে পারে, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসকদের বিভেদনীতির কারণেই হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যকার দাঙ্গা সূত্রপাত ঘটে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন: 'হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ বৃটিশবিরোধী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে ভেদনীতির মাধ্যমে রাজনৈতিক হঠকারিতার আশ্রয় নিয়েছিল বৃটিশ সরকার' (চেঙ্গিশ ২০১৯: ১৩৭)। ইংরেজ শাসকদের কূটকৌশল ও শঠতাপূর্ণ আচরণের জন্যই হিন্দু-মুসলমান বিভেদে লিপ্ত হয়। ভারতবর্ষে ইংরেজরা তাদের শাসন-শোষণকে দীর্ঘস্থায়ী করতেই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়। ভারতীয়রা যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন না করতে পারে সেজন্যেই তারা এ কাজ করেছে। গো-সরদারের জবানিতে লেখক হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যকার সংঘর্ষের প্রকৃত সত্য তুলে ধরেছেন:

> ইংরাজ নামে এক বিদেশী জাতি এই দেশ শাসন করিত। তারা এ দেশের উপর সুবিচার করিত না। তাই হিন্দু-মুসলমান একযোগে ইংরাজের হাত হইতে দেশ উদ্ধার করিবার জন্য স্বরাজ আন্দোলন আরম্ভ করিল। দেশসুদ্ধ লোক ইংরাজের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিল। ইংরাজের রাজত্ব যায় আরকি! এমন সময় ইংরাজ হিন্দুদের কয়েকজনকে ডাকিয়া কানে-কানে কি বলিল! হিন্দুদের মধ্যে আর্যসমাজ নামে একদল বাহির হইল। তারা চিৎকার করিয়া হিন্দুদিগকে বলিতে লাগিল: ইংরাজ গো-মাতার হত্যা সাধন করে বলিয়াই তো আজ আমরা ইংরাজ তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আমাদের সঙ্গীরাই যে গো-হত্যা করে, তাদের আমরা কি করিব? (আবুল মনসুর ২০১৪: ৫৮-৫৯)

তাই হিন্দুরা স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আগে মুসলমানদের হাত থেকে গো-মাতাকে বাঁচাবার শপথ গ্রহণ করে। তারা মুসলমানদের গরু না খাওয়ার নির্দেশ দেয় এবং সেই নির্দেশ না মানলে ইংরেজদের সঙ্গে জাহাজে চড়ে পশ্চিমের দেশে চলে যেতে বলে। মুসলমানরা হিন্দুদের এহেন আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, সুতরাং যুদ্ধ হয়ে পড়ে অনিবার্য। হিন্দুরা গো-মাতাকে রক্ষার নিমিত্তে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অবশেষে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার সংঘর্ষ ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। ইংরেজদের কূটচালে পর্যুদস্ত ভারতবাসীর নির্বুদ্ধিতাকে লেখক ব্যঙ্গ করেছেন এভাবে:

> ইংরাজ তার সমস্ত সৈন্য-সামন্ত লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত থাকিল। সুতরাং খুব শান্তির সঙ্গে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হইতে লাগিল। অবশেষে উভয় পক্ষের সকলেই নিহত হইল, একজন লোকও বাঁচিয়া রহিল না। (আবুল মনসুর ২০১৪: ৬০)

গো-মাতাকে রক্ষার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে হিন্দুদের যেমন, তেমনি গরুর মাংস খাওয়ার ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মুসলমানদেরও ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। ফলে প্রায় জনমানবশূন্য দেশে, বিশেষত ইংরেজ ও মুসলমানদের অনুপস্থিতিতে গরুর সংখ্যা উচ্চ হারে বাড়তে থাকে আর হিন্দু না থাকায় গো-দুগ্ধের প্রাচুর্যে শহর-নগর, পল্লি-পাথার ভেসে যেতে থাকে। যে অল্প সংখ্যক আর্য বেঁচে যায়, তাদের পক্ষে এত বিশাল সংখ্যক গো-দুগ্ধ জীর্ণ করা অসাধ্য হওয়ায় নদী-নালা, খাল-বিল সয়লাব হয়ে যায়। অবশেষে গরুকুল দুধের সাগর সাঁতরে কোনোমতে হিমালয় পর্বতে আশ্রয় নেয় আর আর্য সন্ন্যাসীরা, যারা জীবন বাঁচানোর তাগিদে উচ্চ স্থানের সন্ধানে হিমালয় পর্বতের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তারাও শেষ পর্যন্ত নিজেদের রক্ষা করতে না পেরে দুধের সাগরে ডুবে মরে। তাই এই জনমানবশূন্য আর্যভূমিতে মানুষের সাক্ষাৎ পেয়ে গরুরা আনন্দের জোয়ারে ভাসতে থাকে। তবে এই মানবপ্রজাতির একমাত্র প্রতিনিধির মুসলমান পরিচয় জানতে পেরে ক্ষিপ্ত ষাঁড়েরা শিং বাঁকিয়ে তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে গো-সরদারের আহ্বানে তারা নিরস্ত হয়। সরদার আর্যভূমিতে বুদ্ধ, চৈতন্য, গান্ধী প্রমুখ মহাপুরুষের ক্ষমা ও প্রেমের মহিমা প্রচারের প্রতি সম্মান রেখে তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার যৌক্তিক দাবি উপস্থাপন করে বলে: 'বৎসগণ, এই আর্যভূমিতে একটিমাত্র মানুষ বাঁচিয়া আছে। সে আর্য হোক অনার্য হোক তাকে মারা যায় না। মানবজাতিকে নির্মূল করা উচিত নয়। তোমরা শিং সামলাও।' (আবুল মনসুর ২০১৪: ৫৮)

অথচ গো-রক্ষা আন্দোলনের নামে আর্য হিন্দুরা সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে গো-মাতার সেবার নামে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এক পক্ষকে যুদ্ধে পাঠিয়ে তারা গো-দেবতার সেবার জন্য ঘাস কাটতে যায়। মানবিক মূল্যবোধ-বিবর্জিত এই ধর্মান্ধ হিন্দু-ধর্মীয় নেতাদের কূপমণ্ডূকতাকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন লেখক:

> যুদ্ধক্ষেত্রের আশে-পাশে ঘাস কাটা নিরাপদ নয় মনে করিয়া এবং যোদ্ধাগণের হস্তচ্যুত তরবারি গো-দেবতার গায়ে লাগিয়া গো-হত্যা পাপের অনুষ্ঠান হইতে পারে ভয়ে, আর্য-সমাজীরা ভারতের সমস্ত গরু লইয়া বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ডিং-এ আশ্রয় লইল। (আবুল মনসুর ২০১৪: ৫৯-৬০)

'গো-দেওতা-কা দেশ' গল্পে লেখক গো-রক্ষা আন্দোলনে প্রচারণার কাজে সহায়তার জন্য *আনন্দবাজার পত্রিকার* সাম্প্রদায়িক পৃষ্ঠপোষকতাকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

খেলাফত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত 'নায়েবে নবী' গল্পে ধর্মব্যবসায়ী মোল্লা-মৌলবিদের ভণ্ডামির চিত্র প্রকটিত হয়েছে। একই সম্প্রদায়ের দুই ধূর্ত ধর্মব্যবসায়ীর সন্দেহ, দলাদলি ও পারস্পরিক মতবিরোধের কারণে সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসে চরম ভোগান্তি। মৌলবি সুধারামী ও মৌলবি গরিবুল্লাহ্ ধর্মকে কীভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এবং তাদের অশোভন আচরণ ও বাগ্‌যুদ্ধের সূত্র ধরে গ্রামের সাধারণ নিরীহ মানুষ কীভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তা-ই এ গল্পের আলেখ্য। এসব মোল্লা-মৌলবি সাধারণ মানুষকে সঠিক পথের দিশা না দিয়ে, নিজেদের স্বার্থে মনগড়া বক্তব্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত, বিভক্ত ও দিগ্‌ভ্রষ্ট করে। অর্থ ও ক্ষমতার লোভে তারা ধর্মের মনগড়া

ব্যাখ্যা দেয়। গ্রামের একজন মাতব্বরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তার জানাজায় কে ইমামতি করবে তাই নিয়ে দুই ধর্মধ্বজীর বিপত্তি বাধে। মাতব্বরের জানাজায় গরিবুল্লাহ্ সাহেবকে দেখে সুধারামী সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় ভীত হয়ে মৃতের আত্মীয়-স্বজনকে দ্রুত জানাজা পড়াবার তাগিদ দিতে থাকেন। তিনি বলেন:

> লাশ নিয়ে বসে থাকা বহুত গোনার কাজ। হযরত তিনটা কাজের প্রতি বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। প্রথমতঃ স্ত্রীলোক বিধবা হলে জলদি তার নিকাহ দেওয়া, নামাযের ওয়াক্ত হলে জলদি নামায আদায় করা এবং মাইয়েৎকে ফওরান দাফন করা। এই তিন কাজের মধ্যে আবার হযরত মাইয়েৎ সম্বন্ধেই সবচেয়ে বেশি তাগিদ দিয়েছেন। কারণ লাশ যতক্ষণ কবরস্থ না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর শক্ত আযাব হতে থাকে। (আবুল মনসুর ২০১৪: ৭১)

এই কথা শোনার পর মৃত ব্যক্তির পুত্রেরা জানাজার জন্য লাশ দ্রুত বাড়ির বাইরে নিয়ে আসে। কিন্তু সুধারামী ও গরিবুল্লাহ্ জানাজা নিয়ে দুই রকম ফতোয়া জারি করে—একজন মৃতের শির বরাবর, আর অন্যজন মৃতের সিনা বরাবর দাঁড়িয়ে জানাজার কথা বলে। ফতোয়া জারির ঘটনায় দুই মৌলবি প্রথমে বাগ্‌যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেও ক্রমে তা হাতাহাতির দিকে এগিয়ে যায়। তাদের বাহাসে আকৃষ্ট হয়ে কাজের চাপে যারা প্রথমে জানাজায় আসবে না বলে স্থির করেছিল, তারাও দুই মৌলবির বাহাসের টানে আসতে শুরু করে। বাহাসের একপর্যায়ে তারা পরস্পরের দিকে জুতা নিক্ষেপ করে। গরিবুল্লাহ্ সাহেব 'আল্লাহু আকবার' বলে জানাজা পড়াতে শুরু করলে সুধারামী সাহেব তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে নিজে ইমামতি করতে দাঁড়িয়ে যায়। অবশেষে তর্কলিপ্ত দুই মৌলবির বৈষয়িক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ এর সমাধান খুঁজে বের করে, যা দুজনই মেনে নেয়। সমাধানটি নিম্নরূপ:

> সে বলিল: শির আর সিনা খুব তফাৎ নয়। পা একটু ফাঁক করে দাঁড়ালেই এক পা শির বরাবর আর এক পা সিনা বরাবর থাকবে। এতে উভয়ের মতই বজায় থাকবে। আর এমামতি কে করেন, সেটা ঠিক হয় এমামের পাওনা দিয়ে। এমামের পাওনা উভয় মৌলবির মধ্যে সমান ভাগ করে দেওয়া হোক, তা হলেই উভয়ের এমামতি ঠিক থাকবে। কারও হারজিৎ হবে না। (আবুল মনসুর ২০১৪: ৭৫)

অর্থের সমান ভাগ আর প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন থাকায় দুই মৌলবিই তা মেনে নেন। আর এতে করে প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম নয় বরং অর্থ ও ক্ষমতা দখলই তাদের সকল দ্বন্দ্বের মূলে ক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করে। স্বার্থোদ্ধারের জন্য তারা ধর্মকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করতেও পিছপা হন না।

'নায়েবে নবী' গল্পটি লেখকের জীবনাভিজ্ঞতার শৈল্পিক রূপায়ণ। তিনি যে সময় ও সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময় হানাফি ও মোহাম্মদি—এই দুই মজহাবের মধ্যে বিরোধ, বাহাস, মারামারি, মামলা-মোকদ্দমা এবং পরিণামে জেল-জরিমানার মতো ঘটনা হরহামেশাই ঘটত। আবুল মনসুর আহমদ গোঁড়া মোহাম্মদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও ছাত্রজীবন থেকেই ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে ছিলেন আপসহীন। নিজ মতাদর্শ প্রচারে

তিনি ছিলেন নির্ভীক ও আস্থাশীল। স্বধর্মের অন্ধবিশ্বাসী যেমন তিনি ছিলেন না, তেমনি ধর্মের আচারসর্বস্ব কিছু নিয়মকে তিনি সমর্থনও করতেন না। বাঙালি মুসলমান সমাজকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নেবার জন্য তিনি চাইতেন স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা হোক। কিন্তু তাঁর সমকালে কতিপয় মুসলিম আলেম যে ওয়াজ-নসিহত করতেন, তাতে না ছিল প্রগতিশীলতা, না ছিল তাদের পরোপকারী মনোবৃত্তি। তাঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য নিজের ধর্মের মধ্যেও নানাবিধ বিভেদ-বিভক্তি সৃষ্টি করে রাখতেন। আবুল মনসুর আহমদ চাইতেন মোল্লা-মৌলবিরা বক্তৃতার মাধ্যমে যেন সাধারণ মানুষকে সত্য, উদার ও মুক্ত মনের অধিকারী হতে সহায়তা করে। *আত্মকথায়* তিনি তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষার কথা লিখেছেন:

> শুধু নামায রোযা, হজ-যাকাত ও হায়েজ নেফাসের মসলা-মাসায়েল না বলিয়া চরিত্র গঠন, সত্য কথন, স্বাস্থ্য পালন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, পরোপকার, নাগরিক কর্তব্য, প্রতিবেশির প্রতি কর্তব্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, হক-হালাল রুযি রোজগার ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারে বক্তৃতা করিবার জন্য আমি অনেক মৌলবি বন্ধুকে উপদেশ দিয়াছি। যে কোনোও কারণেই হউক, তাঁরা কেউ আমার কথায় কান দেন নাই। (আবুল মনসুর ২০১৯: ১৬৩)

আবুল মনসুর আহমদ বাঙালি মুসলমান সমাজকে ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার জন্য সারাজীবন কাজ করে গেছেন। তাঁর রাজনীতি, সাংবাদিকতা ও লেখালেখির পেছনে মৌল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অনাচার-কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বাঙালি মুসলিম সমাজের আত্মিক উন্নয়ন। তাই তিনি ধর্মীয় আচার-সর্বস্বতা ও গণ্ডিবদ্ধ চিন্তায় আবদ্ধ মোল্লাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন। 'নায়েবে নবী' গল্পে অর্থলোলুপ, নারীলিপ্সু, কলহপ্রিয়, সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ সুধারামী চরিত্রের মধ্য দিয়ে আবুল মনসুর আহমদ মুসলমান সমাজের অধঃপতনের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। মৌলবি সুধারামী সাহেব গ্রামের সরদার বা শরিয়তি শাসক। তার জন্ম সুধারামে হলেও তাঁর পূর্বপুরুষেরা পশ্চিম থেকে এখানে এসে থিতু হন। নারীলিপ্সু সুধারামী সাহেব ফতোয়া জারি করেন যে, এক জায়গায় দীর্ঘদিন অবস্থান করলে আত্মাকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষার জন্য সেখানে বিবাহ করা সুন্নত। তাই দেশে দুই স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সুধারামী সাহেব কেবল সুন্নতের ইজ্জত রক্ষা ও শয়তানের বদমায়েশির রাস্তা বন্ধ করার অজুহাতে পুত্রহীন এক গৃহস্থের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। সময় সুযোগ হলে তিনি বছরে এক আধবার দেশে রেখে আসা দুই স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসতেন।

গ্রামের অবস্থাপন্ন মানুষদের সুধারামী সাহেব অতিরিক্ত তোয়াজ-তোষামোদ করেন। শুধু তাই নয়, ওয়াজ শুরু করার পূর্বে তিনি তাদের নাম ধরে ডেকে নিশ্চিত হয়ে তারপর ওয়াজ শুরু করেন। ওয়াজ করতে বসে তিনি ভূমিকাতেই দেড় ঘণ্টা শেষ করে যখন মূল বিষয়ে প্রবেশ করবেন তখন বাড়িওয়ালার কাছে থেকে 'খানা তৈয়ারে'র কথা শুনে মুহূর্তেই উপসংহারে নেমে আসেন। আর বলেন 'আল্লাহ্‌র কালাম খোলাসা বয়ান করিতে অনেক সময়ের দরকার। কিন্তু মানুষ দুনিয়ার খেয়ালে এতই মশগুল হইয়া গিয়াছে যে দীনের কথা শোনার কাজে তাহারা মোটেই সময় ব্যয় করিতে চায় না।' (আবুল মনসুর ২০১৪: ৬৪)

সুধারামী সাহেব হাদিসের দোহাই দিয়ে মানুষের কাছে অর্থপ্রাপ্তির আশা করেন। আলেমদেরকে তিনি পরজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চান। আত্মমর্যাদাশীল কোনো মানুষ যে কখনো পরনির্ভরশীল হতে চায় না, সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। পারিবারিক অসচ্ছলতার বর্ণনা দিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হতে চান তিনি। তিনি আলেমদেরকে অর্থসাহায্য দিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার করাকে মুসলমানদের ইমানি দায়িত্ব বলে মনে করেন। হাদিসের স্বেচ্ছাকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে আলেমদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তিনি সমাজের ওপর চাপিয়ে দেন। আর ওয়াজে তিনি খুব জোর দিয়ে মুসলমানদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য অর্থোপার্জনের পথ পরিহার করে পরকালমুখী হবার কথা বলেন:

> হাদিস-কোরআনে কেয়ামতের যে সমস্ত আলামতের বর্ণনা করা হইয়াছে, আজকালকার যমানার হালচাল তার সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলিয়া যাইতেছে। আজকার মুসলমানরা আখেরাত ছাড়িয়া দুনিয়ার আয়েশ-আরামের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দুনিয়ার সুখ মুসলমানের জন্য হারাম একথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। হযরত পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পেটে পাথর বাঁধিয়া দিন কাটাইয়াছেন আজ তাঁহার উম্মত আমরা কিনা দুনিয়ার ফেকেরে মসরুফ আছি। (আবুল মনসুর ২০১৪: ৬৪)

এমন বকধার্মিকদের উদ্দেশ্য করেই হয়তো আবুল মনসুর আহমদ তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে কলকাতায় গঠন করেছিলেন 'লীগ এগেনস্ট মোল্লাইযম' নামের সংগঠন। যার মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় আচার-সর্বস্বতা, কুসংস্কার ও মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। ধর্মবিশ্বাসী সাধারণ মানুষের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে যে সকল ধর্মব্যবসায়ী তাবিজ-কবজ আর ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে জনসমাজে নানা রকম প্রতারণার জাল বিস্তার করেছে তাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে এই সংগঠন। মুসলিম সমাজের সংস্কারের লক্ষ্যে মুসলমানদের অধঃপতনের কার্যকারণ অনুসন্ধানপূর্বক লেখক ও তাঁর বন্ধুরা সিদ্ধান্তে আসেন যে:

> ... মুসলমানদের বুদ্ধি আড়ষ্ট ও চিন্তা অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইসলামের ভাল আদর্শ ত্যাগ করিয়া মুসলমানরা শুধু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই ধর্ম সাধনাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। নমায রোযাকেই তারা একমাত্র ধর্ম কার্য মনে করে। ফলে তারা জ্ঞান লাভের চেয়ে সওয়াব হাসিলের দিকে মন দিয়াছে বেশি। স্কুল-কলেজ স্থাপনের চেয়ে মসজিদ নির্মাণকেই বেশি দরকারি কাজ মনে করিতেছে। মুসলমানদের এই সার্বিক অধঃপতনের জন্য দায়ী মোল্লারা। তারাই ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া মুসলমান জনসাধারণকে অজ্ঞান ও দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। (আবুল মনসুর ২০১৯: ১৬৬)

আবুল মনসুর আহমদ সমকালীন মুসলমান সমাজের একজন সচেতন পর্যবেক্ষক। সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তিনি যেমন পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের নানাবিধ সমস্যায় আলোকপাত করেছেন, ঠিক তেমনি ধর্মীয়, সামাজিক রাজনৈতিক অচলাবস্থা থেকে তাদের উত্তরণের দিশাও দিয়েছেন। সমাজের মঙ্গল কামনাই তাঁর সাহিত্যভাবনার মূলে ক্রিয়াশীল ছিল। সমাজের নানা অসংগতির চিত্র তিনি গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছিলেন বলেই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের কশাঘাতে সাধারণ মানুষের চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোর পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব যাঁদের, সমাজকে কলুষমুক্ত করে যাঁরা মানুষের পরিত্রাণের জন্য নায়েবে নবি হিসেবে আগমন করেছেন, সেই নায়েবে নবিরাই হীন স্বার্থকলহে লিপ্ত হয়ে সমাজকে বিপদাপন্ন করে তুলেছেন। অশিক্ষা, অজ্ঞতা, ভণ্ডামি ও কূপমণ্ডূকতায় এঁরা এতটাই নিমজ্জিত যে, সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির কোনো খবরই তাঁরা রাখেন না। পরিবর্তিত বিশ্ব রাজনীতির দিকে তাঁরা কোনো খেয়াল রাখেন না, আর ধর্মগ্রন্থ ভিন্ন অন্য কোনো যুক্তি মানতে তাঁরা নারাজ। তাই যুবক শিক্ষকের নেতৃত্বে ছাত্ররা যখন ত্রিপলিতে যুদ্ধরত তুরস্কের জন্য প্রতিশ্রুত চাঁদা আদায়ের জন্য মাতব্বরের কাছে আসে, তখন সুধারামী সাহেব রোমের সুলতান ও যুদ্ধ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, তাতে তাঁর অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়:

> কোথায় যুদ্ধ যে তার সাহায্য? কার ঘাড়ে দশটা মাথা যে রোমের সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াই করবে? আর লড়াই বাধলেই যে সুলতান হিন্দুস্থানের সাহায্য চাইবেন, একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? যে রোমের সুলতানের মাল-মাত্তার কথা কোরআন হাদিসে বয়ান করা হয়েছে, হিরা, ইয়াকুৎ, লাল, জওয়াহের যাঁর খাযাঞ্চিখানা বোঝাই, তিনি কিনা যুদ্ধের জন্য ভিক্ষা চাইতে এসেছেন এই হিন্দুস্থানে—এই দারুল হরবে! যত সব মতলববাজ লোক টাকা রোজগারের এ-একটা ফন্দি বের করেছে। নইলে রোমের বাদশাহ—সাত মুলুকের যিনি বাদশাহ—তিনি এলেন ভিক্ষা করতে, এটাও কি একটা কথা হল? যান যান, সাব এ গ্রামের সকলেই উম্মি নয়। এখানে ও সব ঠকামি চলবে না। (আবুল মনসুর ২০১৪: ৬৯-৭০)

এভাবেই ধর্মব্যবসায়ীদের ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচনে আবুল মনসুর আহমদ তাঁর 'নায়েবে নবী' গল্পে সমকালীন সমাজ বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

'লীডরে-কওম' গল্পে হতদরিদ্র ও অর্ধশিক্ষিত ইসমাইল সাহেব মানুষের ধর্মীয় আবেগকে পুঁজি করে প্রতারণার মাধ্যমে কীভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তার চিত্র বিধৃত হয়েছে। ইসমাইল সাহেব 'লীডরে-কওম' গল্পের প্রধান চরিত্র। তাঁর চরিত্রের বিকাশ ও রূপান্তরের মাধ্যমেই এ গল্পের কাহিনি পরিণতি ও পরিপুষ্টি লাভ করেছে। ইসমাইলের জীবনের উত্থান শুরু হয়েছে একটি প্রতারণামূলক কাজের মধ্য দিয়ে। বারবার স্কুল-মাদ্রাসা পরিবর্তন করেও যখন তিনি লেখাপড়ায় সফল হতে পারেননি, তখন পুত্রহীনা বিধবা ফুফুর একমাত্র ছাগশিশু পার্শ্ববর্তী বাজারে বিক্রি করে কলকতায় গিয়ে একটি মসজিদে আশ্রয় নেন। গলার স্বর সুমিষ্ট হওয়ায় প্রথমে তিনি কলকাতার একটি আহলে হাদিস মসজিদের মোয়াজ্জিন এবং পরে সেই মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হন। ইসমাইল সাহেব হানাফি শিক্ষকদের কাছে পড়াশোনা করে অনেকটা হানাফি ভাবাপন্ন হলেও, আহলে হাদিস মসজিদের ভার বহনকারী হাজী সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হানাফি নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন। স্বার্থোদ্ধারের জন্য ইসমাইল যেকোনো আদর্শ গ্রহণ করতেও ছিলেন প্রস্তুত। হানাফিদের গালমন্দ করে জনপ্রিয়তা লাভের পর তিনি পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে ওঠেন এবং হাজী সাহেবের সহযোগিতায় পত্রিকা প্রকাশে সক্ষম হন। পত্রিকার নাম রাখা হয় 'আহলে-হাদিস-গুর্য'। ইসমাইল সাহেব এই পত্রিকায় সুকৌশলে হানাফি মজহাবের নিন্দার পাশাপাশি ইংরেজদের বিরুদ্ধেও নিন্দাপ্রচার করতে শুরু করেন। এভাবে পত্রিকায় ইংরেজ বিরোধিতার মধ্য দিয়ে তিনি হাজী সাহেবের

মনে ভীতির সঞ্চার করেন এবং পুলিশের খানাতল্লাশির ভয় দেখিয়ে নিজেই পত্রিকা ও প্রেসের মালিক বনে যান। এরপর তিনি মওলানা উপাধি ধারণপূর্বক পত্রিকায় ইংরেজ নিন্দার পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক ভাবনা, খেলাফত আন্দোলন ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করে নিজেকে একজন অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পান। কিন্তু তাঁর এই সব কার্যকলাপের পিছনে যেকোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই, বরং ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উপায় হিসেবে তিনি পত্রিকাটি ব্যবহার করেছেন হাজী সাহেবের সাথে তার কথোপকথনে সে কথা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেন:

> আশা করি, সে-বিশ্বাস আপনার এখনো টলে নাই। আপনি পিতৃতুল্য, আপনার কাছে গোপনীয় কিছু নাই। আহলে-হাদিস মত প্রচার করতে গিয়ে আমি বাজারের মামুলি পন্থা অবলম্বন করতে চাই নে। আপনি জানেন, আমি খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচার প্রণালী বহুদিন ধরে অধ্যয়ন করে আস্‌ছি। এ বিষয়ে আমি তাদের নীতিই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। উদারতার ছদ্মবেশে সাম্প্রদায়িক মতবাদ প্রচারেই সাফল্যের আশা অধিক। (আবুল মনসুর ২০১৪: ৮১)

পত্রিকায় প্রচার করা হয় যে, অধঃপতিত বাঙালি মুসলমানের মুক্তির জন্য মওলানা ইসমাইল সাহেব 'এহতেকাফ' বা কঠোর ধ্যানে বসেছেন। এরপর তিনি ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্য 'আঞ্জুমনে-তবলিগুল-ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেই এই সংগঠনের সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পত্রিকায় চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে জনগণের নিকট থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায় করে নিজের পকেট পুষ্ট করেন তিনি। শুধু তাই নয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্যের জন্য গঠিত ত্রাণ তহবিলের টাকাও তিনি নির্দ্বিধায় আত্মসাৎ করেন:

> বেআক্কেলপুরে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হইল। হিন্দু প্রধান স্থান বলিয়া হিন্দুরা মুসলমানদিগকে বেদম মার দিল। 'গুর্যে' নির্যাতিত মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থার মর্মভেদী বর্ণনা বাহির হইতে লাগিল। 'গুর্য' কার্যালয়ে হযরত মওলানা সাহেবকে সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ করিয়া এক রিলিফ-ফান্ড খোলা হইল। স্বয়ং হযরত মওলানা সাহেব দিনরাত খাটিয়া অকুস্থানে গমন করিয়া রিলিফের কাজ করিতে লাগিলেন। (আবুল মনসুর ২০১৪: ৮৩)

বেআক্কেলপুরে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষত শুকাতে না শুকাতে দুর্ভাগ্যপুরের বন্যায় মওলানা ইসমাইল সাহেবের হৃদয় অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য আবার ত্রাণ তহবিল গঠন করে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। প্রচুর টাকা তহবিলে জমা হয় আর পকেট ভারি হয় ইসমাইল সাহেবের। এরই মধ্যে দেশে খেলাফত আন্দোলনের ডাক এলে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম নেতা থেকে বিশ্ব মুসলিমের নেতায় পরিণত হন এবং 'গুর্য' তাকে বাংলার গৌরব হিসেবে আখ্যায়িত করে। কালক্রমে তিনি তাবলিগ, আঞ্জুমান ও খেলাফতের নেতা হবার পর কংগ্রেসেরও অন্যতম নেতায় পরিণত হন। স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগদানের কারণে ইংরেজ সরকার মওলানা সাহেবকে গ্রেফতার করে এবং বিচারে দুই বছরের কারাদণ্ড হলে স্বাস্থ্যনাশের ভয়ে তিন মাস পরেই সরকার তাঁকে মুক্তি দেয়। কারামুক্তি লাভের পর ইসমাইল সাহেব পুলিশের চোখ এড়াতে ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরে পাবার আশায় বাংলা ছেড়ে চিরদিনের

জন্য রাঁচিতে চলে যান। ইসমাইল সাহেবের রাঁচি গমনের আসল উদ্দেশ্য যে পালিয়ে যাওয়া, লেখক সেই সত্যটি ব্যঙ্গাত্মকভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন এভাবে:

> বাংলায় ইসলামকে তার পূর্ণ গরিমায় প্রতিষ্ঠিত করাই হযরত মওলানার আজীবন সাধনা। তিনি আজিও আগের মতই এই সাধনায় শিবরাত্রির শলিতার মতো লোক-লোচনের অন্তরালে নিজেকে তিল-তিল করিয়া বিসর্জন দিতেছেন। তবে স্বভাবতঃই তাঁর সাধনার বাহ্যরূপের একটু পরিবর্তন হইয়াছে। মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। হযরত মওলানাও জীবন সায়াহ্নে উপস্থিত। এই সময়ে তিনি যদি দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য একটা স্থায়ী দান রাখিয়া না যান, তবে হযরত মওলানার অবর্তমানে মুসলিম বাংলা চিরতরে অন্ধকারে নিমজ্জিত হইবে। অথচ রাজনৈতিক হৈ চৈ-এর মধ্যে সে আত্মিক সাধনা সম্ভব নহে। তাই তিনি সহকর্মীদের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্থির করিয়াছেন: একদিন ইসলামের মহাপয়গম্বর যেমন করিয়া সত্যের আলোকের জন্য হেরার নির্জন গহ্বরে আত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এই তের শত বৎসর পরে তাঁরই নগণ্য উম্মত হযরত মওলানা ইসলামের উন্নতি ও মুসলমানদের কল্যাণের জন্য রাঁচির শান্ত প্রকৃতির বুকে সাধানায় আত্মনিয়োগ করিবেন। (আবুল মনসুর ২০১৪: ৮৭-৮৮)

রাঁচি থেকে তিনি আর ফিরে না এলেও ইসলাম ধর্মের উন্নতি ও মুসলমানদের কল্যাণের জন্য নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন অথচ তবলিগ, আঞ্জুমান, খেলাফত, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বন্যার সময় সংগৃহীত অর্থের হিসাবপত্র বুঝিয়ে দেননি। যখনই কেউ 'গুর্য' অফিসে পত্র মারফত কিংবা সভা-সমিতিতে তহবিল সম্পর্কে জানতে চেয়েছে, তখনই তিনি তা এড়িয়ে গেছেন। ইসমাইল সাহেবের মতো লোকেরা এভাবেই ধর্মকে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ আদায় করে নেন। লেখকের বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার মধ্যেই ইসমাইল সাহেবের মতো প্রতারক ও ফন্দিবাজ লোকের অস্থিত্ব বিদ্যমান ছিল, তা না হলে এত নিখুঁতভাবে তাঁর ভণ্ডামির স্বরূপ উন্মোচন সম্ভব হতো না।

'মুজাহেদীন' গল্পটি মুসলিম সম্প্রদায়ের দুই প্রধান মজহাব হানাফি ও মোহাম্মদিদের মধ্যকার মতবিরোধকে কেন্দ্র করে রচিত। একই ধর্মের অনুসারী দুই মজহাবের মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে পুঁজি করে কীভাবে একটি সুবিধাবাদী মহল আপন স্বার্থ চরিতার্থ করে তার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে এই গল্পে। প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বর্ণবিভাজনের প্রথা ভুলে গিয়ে যখন মানুষ হিসেবে সবাইকে সমান মর্যাদা দানের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে, তখন মুসলমান সমাজেও তার প্রভাব পড়েছে। অস্পৃশ্য বলে এতদিন যাদেরকে সমাজ স্বীকৃতি দেয়নি, মুসলমান যুবকেরা তাদেরকে যথাযোগ্য সম্মানের সাথে সমাজে গ্রহণ করার জন্য প্রবীণদের নিকট আবেদন জানিয়েছে। অস্পৃশ্যদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে শুধু প্রবীণদের নিকট আবেদন জানিয়েই তরুণেরা ক্ষান্ত হয়নি, তারা সবাই মিলে গ্রাম থেকে ধান, চাল, পাট সংগ্রহ করে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে জমিদারের কাছ থেকে আদায় করা জমির ওপর ঘর তৈরি করে। তরুণদের এই উৎসাহ প্রবীণদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। তারা গ্রামে শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে একটি মাইনর স্কুল স্থাপন করে এবং কীভাবে সেটিকে হাইস্কুলে রূপান্তর করা যায় সেই চিন্তা করতে থাকে। গ্রামের লোকজন পাশের গ্রামের 'খারেজি' মাদ্রাসার পরিবর্তে স্কুলটিতে আর্থিক সহায়তা প্রদানে অধিক উৎসাহী হয়ে

ওঠে। আগে গ্রামের মানুষেরা মাদ্রাসায় যে টাকা দান করত, সেই টাকা স্কুলের ভাগে চলে যাওয়ায় মাদ্রাসার মৌলবি সাহেব খুবই বিরক্ত হন। এরই মধ্যে মৌলবি সাহেব হঠাৎ করে একজন জবরদস্ত আলেম নিয়ে হাজির হন। তিনি এই নবাগত আলেম সাহেবকে সাথে নিয়ে বাড়ি বাড়ি দাওয়াত খান এবং সকলের কাছে তাঁকে 'আলেম সাহেব' হিসেবে পরিচিত করিয়ে দেন। নবাগত আলেম সাহেবের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গ্রামের লোকজন অল্প দিনেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তিনি স্কুল শিক্ষাকে শরিয়ত-বিরোধী হিসেবে ঘোষণা করেন এবং গ্রামবাসীকে মাদ্রাসা শিক্ষায় সাহায্য করতে বলেন। এ প্রসঙ্গে নবাগত আলেম সাহেবের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> খোদার ফযলে এ গ্রামের সকলেরই অবস্থা ভাল, অথচ দ্বীনি এলেম শিক্ষার জন্য এখানে কোনো মাদ্রাসা নাই; ইহা বড়ই আফসোসের কথা। এই প্রসঙ্গে খারেজী মাদ্রাসার কথা উঠিল। মওলানা সাহেব বলিলেন: বড়ই দুঃখের কথা, বেশুমার আফসোসের কথা, যেখানে খোদা-রসুলের এলেম শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই মাদ্রাসার সাহায্য বন্ধ করিয়া, যেখানে বেদীন নাসারার ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, যেখানে ছেলেদের ঈমান-আমান খাওয়ার কায়দা বাৎলান হয়, হায়েরানে মজলিস কিনা সেই ইস্কুলে সাহায্য দিতেছেন! (আবুল মনুসর ২০১৪: ৯০)

নবাগত আলেম সাহেব শুধু স্কুল-শিক্ষায় অর্থ সাহায্য বন্ধের কথা বলেই বক্তব্য শেষ করেননি, হাদিস-কোরআনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি প্রমাণ করেন যে, স্কুল-শিক্ষায় সাহায্য করা অনেক বড় গোনাহের কাজ। মুসলমানদের এই দুরবস্থার কথা বর্ণনা করতে করতে আলেম সাহেবের চোখ ছলছল করে ওঠে। জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে যার কোনো ধারণাই নেই, সেই আলেম সাহেবের মুখে স্কুল-শিক্ষার অসারতার কথা শুনেও গ্রামের মানুষ তাঁর খুব প্রশংসা করে; যদিও স্কুল-শিক্ষার বিপক্ষে মওলানা সাহেব যেসব যুক্তি প্রদর্শন করেন তাতে তাঁর অজ্ঞানতাই প্রকাশ পায়:

> ইস্কুলসমূহে এমন ধর্ম-বিরুদ্ধ গাঁজাখোরি গল্প ও শিক্ষা দেওয়া হয় যে, দুনিয়াটা গোল এবং তা ঘুরিতেছে। কোরআন পাকে আল্লাহু-জল্লুশান সাফ ফরমাইয়াছেন: পৃথিবী ফরাসের মতো চ্যাপ্টা এবং স্থির। ছেলেবেলা হইতে কোরআনের খেলাফ শিক্ষা দান করিলে ছেলেরা কেন নাস্তিক হইবে না? ইহার জন্য দায়ী ছেলেরা নয়—ছেলেদের অভিভাবকরা। (আবুল মনসুর ২০১৪: ৯১)

মওলানা সাহেবের এসব প্রচারকার্যে কিছু সমর্থক জুটলেও, তাঁর উদ্দেশ্য হাসিল হয়নি। তাই অর্থসংস্থান করার জন্য মওলানা সাহেব নতুন ফন্দি বের করতে শুরু করলেন। যে অঞ্চলে মওলানা সাহেব আগমন করেছেন, সেখানে হানাফি ও মোহাম্মদী উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করলেও কোনো কিছু নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ছিল না। এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের বিবাহ থেকে শুরু করে সামাজিক সকল অনুষ্ঠানেই তারা একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে চলেছে। কিন্তু মওলানা সাহেব তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কে ফাটল ধরিয়ে দিলেন। হযরত মুহম্মদের বরাত দিয়ে তিনি প্রচার করতে শুরু করলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে তেহাত্তরটি ফেরকা হবে, যার মধ্যে একটি ফেরকা বেহেশতে যাবে আর বাকিরা হবে জাহান্নামি। তিনি মোহাম্মদিদের

দোষখি সাব্যস্ত করে হানাফিদের জান্নাতি ফেরকার অংশ হিসেবে ঘোষণা করেন। এই সংবাদ মোহাম্মদি পাড়ায় পৌঁছামাত্র মোহাম্মদিদের সরদার চার পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে হানাফি মাওলানার কাছে প্রতিবাদ জানাতে আসেন। তিনি হানাফি মওলানা সাহেবকে কোরআন-হাদিস দিয়ে তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করতে বললে তিনি বাহাস আয়োজনের কথা বলেন। কিন্তু গ্রামের মানুষ বুঝতে পারে বাহাস অনুষ্ঠিত হলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি হবে, তদুপরি স্কুলের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। কেউ কেউ গ্রামে গ্রামে ঘুরে বাহাস থামানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাদের কথা কেউ শোনেনি। বরং বাহাস আয়োজনের জন্য সবাই আনন্দচিত্তে চাঁদা দিতে শুরু করে। যারা আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে স্কুলের তহবিলে এক পয়সা চাঁদা দিতে পারেনি কিংবা দরিদ্র বলে যাদের নিকট থেকে মুষ্টি ভিক্ষা পর্যন্ত নেওয়া হয় না, তারাও বাহাসের তহবিলে চাঁদা জমা দিতে শুরু করে। বাহাস আয়োজনের পূর্বে সিদ্ধান্ত হলো যে, যুক্তিতর্কে যে মজহাব জয়লাভ করবে পরাজিত পক্ষকে সেই মজহাব গ্রহণ করতে হবে। বাহাস আয়োজনকে কেন্দ্র করে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎসবের একটা আমেজ বিরাজ করে। অর্থের বিনিময়ে তারা নিজ নিজ মজহাবের বড় আলেমদেরকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে। তাদের সৌজন্যে পোলাও-কোর্মাসহ খাবারের বিশাল আয়োজন করা হয়। যথাসময়ে বাহাস শুরু হয়। বহু মানুষের উপস্থিতিতে সভাস্থল সরগরম হয়ে ওঠে। সভা শুরুর আগের দিন সাদত শহরে গিয়ে মুসলমান স্কুল ইন্সপেক্টরকে নিয়ে আসে। তাছাড়া দারোগা সাহেবও উপস্থিত ছিলেন, তিনিও মুসলমান। তারা দুইজনই বক্তৃতায় বাহাসের পরিবর্তে হানাফি-মোহাম্মদি দূরত্ব ঘুচিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধনকে আরো মজবুত করার ওপর জোর দেন। কিন্তু দুই পক্ষের কোনো মোল্লা-মৌলবিরই তাদের কথা ভালো লাগেনি। তাদের বক্তৃতা শুনে হানাফি-মোহাম্মদি উভয় মজহাবের দুজন মওলানা বলে উঠলেন:

> এ সব শরিয়তের মসলা, এসব ব্যাপারে কথা বলিবার তাঁহাদের কোন অধিকার নাই। দুনিয়াবি মসলার উপর দীনি মামলার ফয়সলা করা ইসলামের খেলাফ। ... বক্তৃতায় হানাফি মওলানা সাহেব ইন্‌স্পেক্টর সাহেবকে বেনামাযী বলিয়া তাম্বিহ করিলেন এবং মোহাম্মদী মওলানা সাহেব দারোগা সাহেবের দাড়িহীনতা লইয়া রসিকতা করিলেন। (আবুল মনসুর ২০১৪: ৯৭)

মওলানাদের এই সব স্থূল রসিকতা সহ্য করতে না পেরে বাহাস শুরুর প্রাক্কালে তরুণদের নেতা সাদত নিজেই বক্তৃতা দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায়। চিন্তা-চেতনায় এগিয়ে থাকা সমকালীন হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যকার পার্থক্যের তুলনা করে মর্মস্পর্শী ভাষায় সে তার বক্তৃতা প্রদান করে। কিন্তু কেউ তার কথা শোনেনি, বরং মওলানা সাহেব তাকে বেয়াদব বলে বসিয়ে দেন। সাদতের সাথে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। লেখকের সমকালীন সমাজবাস্তবতা ও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতার কথাই এখানে মূলত চিত্রিত হয়েছে। আবুল মনসুর আহমদ তাঁর *আত্মকথায়* লিখেছেন—'তৎকালে হানাফী মোহাম্মদীর বিরোধ, বাহাছের সভা, সভাশেষে মারামারি এবং পরিণামে মামলা-মোকদ্দমা ও জেল-জরিমানা ছিল সাধারণ ব্যাপার।' (আবুল মনসুর ২০১৯: ১৩৭-১৩৮)

সভার বিচারক স্থানীয় জমিদারের হিন্দু নায়েব, সভাপতির আসন গ্রহণ করে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের পক্ষে যুক্তি দিলে মওলানারা তাঁকেও অপদস্থ করেন। অবশেষে বাহাস শুরু হলো। মওলানা সাহেবরা জনতার মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সংঘাত-সংঘর্ষ ছড়িয়ে দিয়ে পলায়ন করেন। কয়েকজনের মৃত্যু আর বহু মানুষের আহত হওয়ার মধ্য দিয়ে অবশেষে বাহাস সমাপ্ত হয়। যে মুজাহিদগণের মূল কাজ হওয়া উচিত ছিল ধর্মের অপব্যাখ্যাকারী ও ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতিহত করে সাধারণ মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে আসা, তারাই কিনা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নিজ সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে হানাহানি বাধিয়ে দেয়। এদেরকে পোশাকে ধার্মিক মনে হলেও, মনের দিক থেকে এরা যে নিকৃষ্ট প্রকৃতির তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'বিদ্রোহী সংঘ' গল্পে আবুল মনসুর আহমদ ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে এ দেশীয় এক শ্রেণির সুবিধাবাদী বিদ্রোহীর মুখোশ উন্মোচন করেছেন। খেলাফত আন্দোলনে সমগ্র দেশে যখন রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করছে তখন গল্পকথক বিএ পাস করে ইংরেজদের তাঁবেদারি করার জন্য ডেপুটিগিরির স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পুরো ভারতবর্ষ যখন বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে, তখনও ব্যক্তিস্বার্থের কথা বিবেচনা করে সে আন্দোলনকারী জনতা ও নেতাদের খামখেয়ালিপনায় বিরক্তি প্রকাশ করে। শুধু তাই নয়, আন্দোলনকারী বিশ হাজার ভারতীয়কে যখন অন্যায়ভাবে ইংরেজ সরকার কারাগারে নিক্ষেপ করে, গল্পকথক তখনও আন্দোলন-সংগ্রামে একাত্মতা পোষণ না করে ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি পাবার আকাঙ্ক্ষায় বিভোর থাকে। ইংরেজ সরকারের কোনো অকাণ্ড-কুকাণ্ডই তার ইংরেজ-ভক্তিতে ফাটল ধরাতে পারে না। কিন্তু যেদিন জেমস সাহেব তাকে বারবার চাকরি দেবার আশ্বাস দিয়েও চাকরি না দিয়ে অফিস থেকে বের করে দেন, সেদিন ইংরেজদের বিচারহীনতায় গল্পকথক খুব চটে যায়। তার ইংরেজ-বিরোধী বিদ্রোহী মনোভাব অকস্মাৎ বেড়ে যায় যখন বিনা টিকিটে ট্রামে চড়ার অপরাধে গোরা চেকার তাকে সার্জেন্টের হাতে সোপর্দ করে জরিমানা দিতে বাধ্য করে। ট্রামে জরিমানা প্রদান করে ইংরেজ সম্পর্কে গল্পকথকের এতটাই বিরূপ ধারণা জন্মে যে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা উপলব্ধি করে ভারতবর্ষ থেকে কীভাবে ইংরেজদের তাড়ানো যায় সেই সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে সে। গল্পকার ব্যঙ্গাত্মকভাবে কথকের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাবের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন:

> আমি স্থির করিলাম। ইংরাজ জাতিকে হয় ভারতবর্ষ হইতে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিব, নয় তো উহাদিগকে আমাদের আরদালি করিয়া রাখিব। এই মতলবে আমি এতোই কঠোর হইয়া উঠিলাম যে, হাজার অনুরোধ-উপরোধেও আমার মনে ইংরাজদের প্রতি দয়ার উদ্রেক হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিল না। (আবুল মনসুর ২০১৪: ১০২)

ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ তাড়াবার লক্ষ্যে গল্পকথক অনেক বিপ্লবীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাদের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবের অভাব লক্ষ করে হতাশায় ভেঙে পড়ে। সারা বাংলা ঘুরেও ইংরেজ-বিরোধী কোনো মানুষ খুঁজে না পেয়ে গড়ের মাঠে বসে যখন সে আকাশপাতাল ভাবছে, ঠিক সেই সময় একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তার দেখা হয়। তার কাছে সে ঢাকার 'বিদ্রোহী সংঘে'র নাম শুনে পরদিনই ঢাকায় চলে আসে। ঢাকায় এসে নিরুপায় হয়ে সরকারি স্কুলের শিক্ষক-বন্ধু আফতাব হোসেনের বাসায় আশ্রয় নেয় সে। তার কাছেই

সে 'বিদ্রোহী সংঘে'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারে। সে জানতে পারে, দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং প্রথা ও সংস্কারের দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করাই বিদ্রোহী সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ-বিরোধিতা নয়, 'বিদ্রোহী সংঘে'র সদস্যগণ তথাকথিত বিশ্বমানবতার আদর্শ ও সোশাল রিফর্মের নামে মূলত ইংরেজ-তোষণকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে। বিদ্রোহী সংঘের সর্দারের বক্তব্যে তাও স্পষ্ট:

> কিন্তু ইংরেজ আমাদের হাত-পাই বেঁধে রেখেছে, আত্মা তো বাঁধে নি। আমাদের স্থূল দেহই ইংরাজের অধীন, আমাদের সূক্ষ্ম দেহের উপর তাদের কোন হাত নেই। যত সব বিধি-নিষেধই আমাদের সূক্ষ্ম দেহকে বন্ধনের অধীন করে রেখেছে। সে জন্য ইংরাজের চেয়ে আমাদের বড় শত্রু এই সমস্ত কুসংস্কারপূর্ণ বিধি-নিষেধ। এ সমস্ত নিগড় না ভাঙলে সভ্যতার পথে আমাদের পথ চলা অব্যাহত হবে না। বিধি-নিষেধের বন্ধনের চাইতে তুমি যে ইংরাজের বাঁধনকেই বড় করে দেখছ, এতে করে তুমি মানুষের দেহকে আত্মার উপর স্থান দিচ্ছ। (আবুল মনসুর ২০১৪: ১১১)

লেখকের সমকালে 'বিদ্রোহী সংঘে'র সর্দার কিংবা গল্পকথকের মতো বিদ্রোহীদের অভাব ছিল না, যারা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যর্থ হয়ে ইংরেজ-বিরোধী হয়ে উঠেছিল। এরা বাইরে বিদ্রোহী হলেও ভেতরে ভেতরে ইংরেজ রাজশক্তির ভয়ে ভীত। ইংরেজ শোষকগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের কোনো দ্বন্দ্ব নেই, ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ তাড়ানোও তাদের উদ্দেশ্য নয়। এরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যর্থ হয়ে লোকদেখানো বিদ্রোহীর ভেক ধরেছে। গল্পকথকের বিদ্রোহী হবার নেপথ্যেও লুকিয়ে আছে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ না হবার বেদনা:

> কিন্তু অবশেষে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। আমার ভিতরে ইংরাজ-বিদ্বেষের বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল সেইদিন—পুনঃপুন চাকুরির ভরসা দিয়াও যেদিন জেম্‌স সাহেব আমাকে তাঁহার অফিসগৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য তাঁহার আরদালিকে হুকুম দিয়া বসিলেন। (আবুল মনসুর ২০১৪: ১০১)

গল্পকথক 'বিদ্রোহী সংঘে'র সদস্যদের প্রথা ও সংস্কার ভাঙার নামে ইংরেজ-তোষণের কার্যকলাপে নিরাশ হয়ে রমনার মাঠে বসে যখন ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে ভাবছে, তখন কলকাতার গড়ের মাঠের সেই বন্ধুর সাথে তার পুনরায় সাক্ষাৎ হয় যার মাধ্যমে সে ঢাকার 'বিদ্রোহী সংঘে'র সন্ধান পেয়েছিল। অবশেষে সেই বন্ধুটি গল্পকথকের কাছে তার আসল পরিচয় দিয়ে বিদ্রোহী সংঘের চরিত্র সম্পর্কে বলে: 'ওদের একটা বেটার মধ্যে রিভোলিউশনারি স্পিরিট নেই—সব বেটাই গর্দভ' (আবুল মনসুর ২০১৪: ১১৩)। অতঃপর গল্পকথক 'বিদ্রোহী সংঘ' ত্যাগ করে। বন্ধু আফতাবকে সে সিআইডির ঘটনাটি জানালে বিদ্রোহী সংঘের সবাই তাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে এবং সংঘের সর্দার ইংরেজদের প্রতি তাদের আনুগত্যের প্রমাণ-স্বরূপ ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ বরাবর দুখানা পত্র লিখে জানিয়ে দেয়: 'বিশ্বমানবতাই আমাদের আদর্শ, সোশিয়্যাল রিফর্মই আমাদের কর্মপদ্ধতি, আর রাজ-ভক্তি প্রচারই আমাদের জীবনের ব্রত, বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য আমরা প্রাণ দিতে পারি' (আবুল মনসুর ২০১৪: ১১৩)। এই হলো তাদের বিদ্রোহের নমুনা। বিদ্রোহের নামে তারা অর্থহীন

ভাবুকতায় মত্ত হয়ে ইংরেজদের তোষামোদী ও দালালি করাকেই জীবনের আদর্শ মনে করেছে। দেশ ও জাতির পরাধীনতার গ্লানি এদেরকে স্পর্শ করেনি। 'বিদ্রোহী সংঘে'র হুজুগসর্বস্ব উদ্দেশ্য সম্পর্কে সমালোচক যথার্থই বলেছেন: 'বিদ্রোহী সংঘে' আছে এর সদস্যদের কথা—এরা প্রথাবিরোধী, কিন্তু স্বদেশের জন্যে কোনো কষ্ট স্বীকারে তারা প্রস্তুত নয়, কারণ মুখে যদিও তারা বিশ্বমানবতার আদর্শ প্রচার করে তবে অন্তরে রাজশক্তিতে ভীত।' (আনিসুজ্জামান ২০১৫: ১৭২)

'ধর্ম-রাজ্য' গল্পে চিত্রিত হয়েছে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের পারস্পরিক বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার ফলে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎস ঘটনা। গল্পকথক একটি পত্রিকার সম্পাদক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে গল্পের প্লট খুঁজতে গিয়ে নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়েন এবং নিদ্রার ঘোরেই তিনি বর্তমান গল্পের মৌল ঘটনাটি বিবৃত করেন। প্রচণ্ড কোলাহলের আওয়াজ শুনে গল্পকথক বাইরে এসে দেখতে পান—ইসলাম ধর্মের ইজ্জত রক্ষার্থে হাজার হাজার মুসলমান হাতে ইট, পাটকেল, ছুরি, লাঠি, গাছের ডাল নিয়ে শহরের পশ্চিম অংশের দিকে খুব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। কথক বিপন্ন ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী একজনের কাছে এই আন্দোলনের কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন:

> হিন্দুরা মসজিদের সামনে দিয়া বাদ্য বাজাইয়া মিছিল বাহির করিবে। আমরা বাধা দিব। সে বাধা ঠেলিয়া হিন্দুরা দলে দলে লাঠিসোটা লইয়া অগ্রসর হইবে। তাই আমরা ইসলামের ইজ্জতের জন্য জান নেসার করিতে ছুটিয়াছি। তোমার যদি মুরোদ থাকে, তবে ধর্মের জন্য প্রাণ দিয়া শহীদ হইবার এই সুযোগ ছাড়িও না। (আবুল মনসুর ২০১৪: ১১৭)

অপরদিকে হিন্দু সম্প্রদায় জাত-বর্ণ নির্বিশেষে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে গগনবিদারী 'কালী মাইকি জয়' ধ্বনিতে মসজিদের সামনে বাদ্য বাজিয়ে হিন্দুধর্মের জয় ঘোষণা করছে। আর মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা 'আল্লাহু-আকবর' ধ্বনিতে হিন্দুদের প্রতিহত করতে গেলেই শুরু হয় দাঙ্গা। সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের এই রক্তাক্ত দাঙ্গার নেতৃত্বে গান্ধী টুপি পরা কংগ্রেস নেতারা যেমন ছিলেন, তেমনি চান-তারা মার্কা মোহাম্মদ আলী ক্যাপ পরিহিত খেলাফতি নেতারাও ছিলেন। তাদের প্রত্যক্ষ মদদ ও সহযোগিতায় উভয় সম্প্রদায়ের শত শত মানুষ হতাহত হয়। আর দাঙ্গা চলাকালে ইংরেজ সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। পুলিশের বড়কর্তা ইংরেজ সাহেব দাঙ্গার সময় দূরে দাঁড়িয়ে থেকে যুদ্ধরত হিন্দু-মুসলিমের স্বর্গগমনের তামাশা দেখছিলেন। শান্তিরক্ষার এহেন নমুনা প্রত্যক্ষ করে একজন ভদ্রলোক যখন ইংরেজ পুলিশ কর্তার কাছে জানতে চান, এ কেমন শান্তিরক্ষা—যেখানে শত শত মানুষ হতাহত হচ্ছে অথচ পুলিশের পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রতিহত করার কোনো চেষ্টা নেই! তখনই দর্শকরূপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা তাদের নৃশংস মানসিকতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে যায়। ইংরেজ পুলিশকর্তার জবানিতে লেখক বলেছেন, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা যতদিন কার্যকর থাকবে, ততদিন ভারতবাসী ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হবে। ইংরেজরা তাই চায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যকার বিভক্তি-বৈষম্য যেন বাড়তেই থাকে। কারণ তারা জানে, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্তি-বৈষম্য, ঘৃণা-বিদ্বেষ যত বাড়বে, ভারতবর্ষে তাদের শাসন তত দীর্ঘমেয়াদী ও নিরাপদ হবে।

ধর্ম-যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সারা কলকাতা শহরে ছড়িয়ে পড়ায় উভয় সম্প্রদায়ে প্রাণহানির সংখ্যা যখন বেড়েই চলে, তখন ইংরেজ সরকারের কাছে সমাধান চাওয়া হলে তারা ফরমান জারি করে:

> যে-সব জায়গায় মসজিদের সংখ্যা খুব বেশি, সেইসব অঞ্চল মুসলমান-মহল্লা বলিয়া ঘোষিত হইবে; তথায় দুই-একটা মন্দির থাকিলেও সে অঞ্চলে মসজিদের সামনে বাদ্য বাজানো চলিবে না। পক্ষান্তরে, যে-সব অঞ্চলে মন্দিরের সংখ্যা খুব বেশি, সে সব অঞ্চল হিন্দু-পল্লী বলিয়া ঘোষিত হইবে; সেখানকার মসজিদের সামনে হিন্দুরা যত ইচ্ছা বাজনা বাজাইতে পারিবে। আর, যে-সময়টাতে মুসলমানরা নামায পড়িবে না, সেই সময়ে হিন্দুরা মুসলমান-মহল্লায় মন্দিরে গিয়া পূজা দিয়া আসিবে, এবং যে সময়টা হিন্দুদের পূজার সময় নয়, সেই সময়ে মুসলমানরা হিন্দু-পল্লীস্থ মসজিদসমূহে গিয়া আযান দিয়া আসিবে। (আবুল মনসুর ২০১৪: ১২১)

ইংরেজ শাসক কর্তৃক সমস্যার এমন সমাধানে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামি না কমে আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে। উভয় সম্প্রদায় ধর্মের জয় ঘোষণা করতে গিয়ে কলকতা শহরের সব বাড়ি-ঘর, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, মক্তব-মাদ্রাসা, দোকানপাট সবকিছুকে মন্দির বা মসজিদে পরিণত করে। আর দৈনন্দিন কাজকর্ম ও রান্নাবান্না ফেলে রেখে হিন্দু-মুসলিম ছাত্র-শিক্ষক, কেরানি-চাপরাশি, দোকানদার-খরিদ্দার, ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ সবাই দিনরাত নামাজ-পূজায় এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, ক্ষুধায় কাতর ধর্ম-যোদ্ধারা ধর্মের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গল্পকথক লাট সাহেবের সাথে রাস্তায় বেরিয়ে দেখলেন, ধর্মের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী হিন্দু মৃতদেহগুলোর বুকে আবিরের অক্ষরে 'আর্যবীর' আর মুসলমান লাশগুলোর বুকে রুপালি হরফে 'শহীদ' লেখা রয়েছে। লাট সাহেব ধর্মপ্রাণ বাঙালি জাতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের একমাত্র জীবিত প্রতিনিধি গল্পকথকের সামনে এরোপ্লেন থেকে নেমে খুঁটিতে বাঁধা একটি সাইনবোর্ড স্তূপীকৃত লাশের মধ্যে পুঁতে দেন, যেখানে লেখা—'ধর্ম-রাজ্য'। স্বার্থান্বেষী ইংরেজ হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে সুকৌশলে কার্যসিদ্ধির পর জয়সূচক রুমাল উড্ডীন করে এরোপ্লেনে করে চলে যায় আর ধর্মের ইজ্জত রক্ষর নামে হানাহানি করে হিন্দু-মুসলমান নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। গল্পকার আবুল মনসুর আহমদ ব্যঙ্গের মাধ্যমে দেখিয়েছেন, অবশেষে 'ধর্ম-রাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঠিকই, তবে সেই 'ধর্ম-রাজ্য' জীবিত লোকদের নিয়ে নয়, মৃতদের নিয়ে।

আবুল মনসুর আহমদ তাঁর *আয়না* গ্রন্থে সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির বাস্তব চিত্রাঙ্কনে পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি সমাজকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন বলেই 'হুযুর কেবলা', 'গো-দেওতা-কা দেশ', 'নায়েবে নবী', 'লীডরে কওম', 'মুজাহেদীন', 'বিদ্রোহী সংঘ' ও 'ধর্ম-রাজ্যে'র মতো গল্পগুলো লিখতে এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধত্ব, অন্যায়-অবিচার, সামাজিক ও রাজনৈতিক অসংগতির চিত্র উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন। তাঁর গল্পের পীর সাহেব, সুফী সাহেব, সুধারামী সাহেব ও লীডরে কওমদের মতো চরিত্রগুলো তাঁর সমকালের অভিজ্ঞতা থেকে লিখিত হলেও বিষয়বস্তু হিসেবে এখনও

তা সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক। *আয়না* গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি তৎকালীন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিতকে তীক্ষ্ণ ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। সমাজ-রাষ্ট্রকে পরিশুদ্ধ ও মানবিক করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই যে তিনি এসব গল্প লিখেছেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

আবুল মনসুর আহমদ (২০১৪)। *আয়না*। ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস।

আবুল মনসুর আহমদ (২০১৯)। *আত্মকথা*। ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (২০১৫)। 'সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ', *আবুল মনসুর আহমদ স্মারকগ্রন্থ* (ইমরান মাহফুজ সম্পাদিত)। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

আজহার ইসলাম (২০১৪)। *বাংলাদেশের ছোটগল্প: বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*। ঢাকা: অনন্যা।

আনিসুজ্জামান ((২০১৫)। 'আবুল মনসুরের আয়না', *কালের ধ্বনি: দুর্লভ কথক আবুল মনসুর আহমদ* ৫ম সংখ্যা (ইমরান মাহফুজ সম্পাদিত)। ঢাকা: বিনিময় প্রিন্টার্স।

নুরুল আমিন (২০১১)। *আবুল মনসুর আহমদের কথাসাহিত্য*। ঢাকা: ঐতিহ্য।

মিজানুর রহমান (২০০৮)। *আবুল মনসুর আহমদের চিন্তাধারা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (২০১৫)। 'আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গে', *আবুল মনসুর আহমদ স্মারকগ্রন্থ* (ইমরান মাহফুজ সম্পাদিত)। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

মো. চেঙ্গিশ খান (২০১৯)। *আবুল মনসুর আহমদের জীবনদর্শন ও সৃজনভুবন*। ঢাকা: ডেইলি স্টার বুকস।

রাজীব হুমায়ুন (১৯৮৫)। 'আবুল মনসুর আহমদের রাজনৈতিক ব্যঙ্গরচনা', *সাহিত্য পত্রিকা*। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সরিফা সালোয়া ডিনা (২০২২)। 'ব্যঙ্গরসাত্মক গল্প: প্রসঙ্গ আয়না', *আবুল মনসুর আহমদের আয়না: বিষয় ও প্রকরণ* (রিষিণ পরিমল ও হাসান অরিন্দম সম্পাদিত)। ঢাকা: শোভা প্রকাশ।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০১৫)। 'যেখানে আবুল মনসুর আহমদ স্বতন্ত্র', *আবুল মনসুর আহমদ স্মারকগ্রন্থ* (ইমরান মাহফুজ সম্পাদিত)। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।